ISSN 1813-0402

A RESEARCH JOURNAL

Volume-16 2010-11

গবেষণা পত্রিকা

FACULTY OF ARTS
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

A Research Journal

গবেষণা পত্রিকা

Vol. 16, 2010-2011

Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal (Faculty of Arts)
Rajshahi University

Vol. 16
November 2010

Published by

Professor Dr. Md. Shahidullah
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University
Rajshahi 6205

Cover Design
Josi Chowdhury

Composed by
The Active Computer Centre
Binodpur Bazar, Rajshahi

Printed by
Mahanagor Printing & Packaging Press
Kumarpara, Rajshahi - 6100

Price: Tk. 200.00 US $ 6

Contact Address

Chief Editor
A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University
Rajshahi-6205, Bangladesh

সূচীপত্র

মো. আবদুস সোবাহান	বটতলার ছাপাই ছবির স্বরূপ অন্বেষণ: প্রেক্ষিত ঔপনিবেশিক বাংলা	১
মো. শফিউল্লাহ	কবি ফায়যী ও তাঁর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা	১৫
প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যাকাত: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৭
প্রফেসর মর্ত্তুজা খালেদ	প্রাচীন মিশরে ধর্ম: বুক অব ডেথ অবলম্বনে একটি সমীক্ষা	৪৭
প্রফেসর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ	কুর'আন মাজীদ থেকে আহরিত জ্ঞান-বিজ্ঞান: প্রাসঙ্গিক আলোচনা	৬৩
Dr. Dilshad Ara Bulu	Prohibition of Riba: Socioeconomic Justifications	৮৩
মু. খলিলুর রহমান	চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী: সমাজ ও জীবন	৯১
শায়খুল ইসলাম মামুন জিয়াদ	ইংল্যান্ডের কৃষকপত্নী এবং খামার অর্থনীতিতে তাদের অবদান, ১৭০০-১৮৫০	১০৫
ড. মোহাম্মদ আলী	প্রাচীন বাংলার ধাতব কারুশিল্প: একটি পর্যালোচনা	১১৯
ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর	আল ফীরূযাবাদী প্রণীত অভিধান আল কামূসুল মূহীত: পর্যালোচনা	১৪৩
ড. মুহা. শহীদুল্লাহ	ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া'হ লঙ্ঘনের প্রকৃতি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	১৫৫

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৬তম সংখ্যা, ২০১০-২০১১, ISSN 1813-0402

বটতলার ছাপাই ছবির স্বরূপ অন্বেষণ: প্রেক্ষিত ঔপনিবেশিক বাংলা

মো. আবদুস সোবাহান*

[সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় বটতলায় ইউরোপীয়দের সাহচর্যে মুদ্রণশিল্পের সূচনা ঘটে। এই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি সচিত্রকরণের ক্ষেত্রে মুদ্রণশিল্পের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঔপনিবেশিক বাংলার বটতলায় ছাপাই ছবির সূত্রপাত ঘটে। গ্রন্থসচিত্রকরণের সাথে সাথে এক সময় বড় আকৃতির স্বতন্ত্র কাগজেও ছাপাই ছবির চর্চা শুরু হয়। গুরু শিষ্য ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কের মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়া প্রসারতা লাভ করতে থাকে। যার সৃষ্টির মূলে ছিল বটতলার অশিক্ষিত বাঙালি পটুয়ারা, যাদের শিল্প সম্পর্কীয় তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না। তবুও জীবন যাপনের তাগিদেই বাণিজ্যিকভিত্তিতে তাদেরকে এই পেশা বেছে নিতে হয়েছিল। সেসময় এখানে আগত বৃটিশ খোদাই শিল্পী ও মুদ্রাকরের সাহচর্যে ও আনুকুল্যে তা সম্ভব হয়েছিল। এই বটতলার অশিক্ষিত খোদাই শিল্পীরা ছাপাই কৌশলের বহুমাত্রিক মাধ্যমে শিল্পচর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখেন। প্রাপ্ত বটতলার ছাপাই ছবি সমূহে অনেক শিল্পীর স্বাক্ষর নিদর্শন পরিলক্ষিত না হলেও এবং বটতলার অশিক্ষিত খোদাই শিল্পীদের অংকনরীতিতে একাডেমিক গুণাগুণ পরিলক্ষিত না হলেও তাদের ছাপাইকর্মে অংকনরীতি, বিষয়বৈচিত্র্য ও কৌশলপ্রয়োগে আধুনিকতা এবং একই সাথে স্বকীয় শৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বটতলার ছাপাই ছবির আধুনিক শিল্পভাবনা ও কলাকৌশল পরবর্তীকালে যে শুধু ভারতের শিল্পকেই সমৃদ্ধ করেছে তাই নয়, ইউরোপের শিল্পকেও প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।]

সূচনা

ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পমাধ্যমে বহুবিধ প্রয়োগ কৌশলের আর্বিভাব ঘটে মূলত ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে। এসময় শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং ধর্মীয় বাণী ও অন্যান্য তথাদি জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারার্থে মুদ্রণশিল্পের সুচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় অবিভক্ত বাংলায় মুদ্রণশিল্পের আগমন ঘটে। ফলে উনিশ খ্রিস্টাব্দের শেষার্দ্ধে কলকাতার শোভাবাজার এবং চিৎপুর অঞ্চলের একটি বট বৃক্ষকে কেন্দ্র করে ছাপাখানা ব্যাপকহারে গড়ে ওঠে। প্রকৃত অর্থে এসব ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িকপত্র, ম্যাগাজিন, পত্রিকা ইত্যাদি সচিত্রকরণের প্রয়োজনেই বটতলায় ছাপাই ছবির সূত্রপাত ঘটে।

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বটতলার ছাপাখানায় যে সকল শিল্পী কাজ করতেন তারা ছিলেন অশিক্ষিত। অর্থাৎ ছাপচিত্র বিষয়ে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে এ সকল শিল্পীর সিংহভাগ কাঠ এবং ধাতু তক্ষণের অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে ছাপচিত্রের ব্লক তৈরির ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। পক্ষান্তরে কাঠ ও ধাতু তক্ষণের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তাদের পক্ষে ছাপচিত্রে বাংলার নিজস্ব নকশার মোটিফ যেমন আলপনা, নকশীপিঠা, কাঁথা, দেবদেবী বিষয়ের গড়ন দেওয়া সহজ হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ছাপাখানায় বিভিন্ন বিষয়ের চটিবই ছাপা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ সকল বইয়ে চিত্র সংযোজন হয়েছে। ফলে চিত্রযুক্ত এ সকল প্রকাশনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ছাপচিত্রীদের কদর বাড়ে। গ্রন্থ সচিত্রকরণের সাথে সাথে এক পর্যায়ে শিল্পীরা পৃথক কাগজে ছাপ তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেন। কাঠখোদাই-এর পাশাপাশি লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতেও এ সকল শিল্পীরা চিত্র চর্চা করেছেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এভাবেই বটতলার ছাপচিত্র তৎকালে শিল্পাঙ্গনে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়।

১. প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ছাপের উদ্ভব

ভারতবর্ষে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ছাপ নেওয়ার ধারণার প্রমাণ রয়েছে। যেমন: তেল, সিঁদুর রঞ্জিত সতীর হাতের ছাপ সরাসরি নিকটস্থ মন্দিরের দেয়ালে লাগানোর পর সতীদাহকার্য সম্পাদন ও হিন্দু সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী কোনো বয়স্ক ব্যক্তির দাহকার্য সম্পাদনের পূর্বে তার পায়ের আলতা বা চন্দন রঞ্জিত ছাপ কাগজে বা কোনো সমতল পটে উদ্ভাসিত করে স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার রীতির প্রচলন ছিল। এছাড়াও এক সময় রাজা বা সম্রাটের কোনো আদেশ কিংবা ফরমানে তাঁদের সম্মতি বা উপস্থিতি প্রকাশ করতে তাঁদেরই সরাসরি হাতের ছাপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল বলে অনুমেয়। আমাদের ভারতবর্ষে এক সময় 'জমির অর্পিত লিখিত বিবরণ বা দলিল তামার পাতে তক্ষণ এবং ধাতব সামগ্রীর উপরিতলে ধর্মীয় ও লোকায়িত প্রতিরূপ খোদাই করার রীতি ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত ছিল। হাড়, কাঠ, হাতির দাঁত, সীল এবং প্রাণী দেহের শক্ত খোলস ইত্যাদি বিভিন্নধর্মী সামগ্রীর উপরিতলে সুদক্ষভাবে এচিং করা হতো, যা লৌকিক হস্তশিল্প হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ছাপার মূল ব্লক হিসেবে সীলমোহর ব্যবহৃত হতো'।[১]

এছাড়াও এক সময় ভারতবর্ষে প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে কাঠের ব্লকে ছাপ নেওয়ার রীতিরও বহুল প্রচলন ছিল। অনেক গবেষক মনে করেন, তিব্বতী কিংবা নেপালী প্রণালীর অনুকরণে কাঠের ব্লকের ওপর সম্পূর্ণ খোদাই প্রায় দু'শ বছরের পুরানো পাণ্ডুলিপির নির্দশন রয়েছে। যথাসম্ভব জানা যায়: 'ভারতীয় পুঁথিতে ছবি আঁকা শুরু হয় খ্রীস্টীয় দশম শতকের পরে। সে সব ছবি হাতে আঁকা। তার মানে এই নয় যে, খোদাইয়ের কাজ একেবারে অজানা ছিল এদেশে। শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অনেক নমুনা রয়েছে ভারতের নানা জাদুঘরে। প্রাচীন দলিল দাস্তাবেজে রয়েছে খোদাই-কর্মের অন্যরূপ, রাজকীয় সীলমোহরের ছাপ'।[২]

প্রাচীন ভারতে সম্ভবত চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে কাপড় অলংকরণের ক্ষেত্রে কাঠের ব্লকযোগে ছাপার প্রচলন ছিল। এবং কাঠখোদাই ব্লক কৌশলে কাগজে ছাপ পদ্ধতি সম্ভবত এর পরিবর্তিত স্বরূপ। এদতসত্ত্বেও ভারতে আধুনিক কালের যাত্রার পুর্বে কাঠের ব্লক দিয়ে কাগজে ছাপ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এর মূল কারণ হতে পারে প্রয়োজনীয় কাগজের অভাব।

২. পর্তুগীজ ও ঔপনিবেশিক বাংলার মুদ্রণশিল্পের উন্মেষ

ভারত উপমহাদেশে কালচক্রে পর্তুগীজ ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের পর্যায়ক্রমে আগমন ঘটে। ক্রমেই তাঁদের ধর্ম, কৃষ্টি, আচার-আচরণবিধিকে শাসনতন্ত্রের অন্যতম মূল ঢাল হিসেবে প্রয়োগ করতে তা ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে এদেশে মুদ্রণশিল্পের প্রচলন করেন। মুদ্রণশিল্পের ক্রমধারায় এক সময় এই অবিভক্ত বাংলার বটতলায় ছাপাই ছবির উন্মেষ ঘটে।

ভারতকোষের তথ্য মতে, পর্তুগীজদের অনুসরণে ভারতের গোয়ায় মুদ্রণ পদ্ধতি অনুপ্রবেশ করে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।[৩] ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান। ফলে কোম্পানীর সরকারকে প্রজাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এই প্রশাসনের তাগিদে তাঁরা এদেশের লোকেদের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রাজনীতি জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই লক্ষে আমাদের বাংলাদেশে ছাপাখানার আগমন ঘটে গোয়ায় ছাপাখানা আসার ২২২ বছর পর, অর্থাৎ 'খ্রিস্টীয় ১৭৭৭-৮ অব্দে'।[৪]

ইঙ্গ-ভারতী কোম্পানির কর্মচারীদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দানের প্রয়োজনার্থে বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত হ্যালেড (N.B Halhed) ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে বাংলা ভাষায় উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরের ব্লক বা ছাঁচ তৈরির প্রয়োজন পড়ে। এই ব্লক তৈরির জন্য ইংরেজ কোম্পানির অপর কর্মচারী সংস্কৃতজ্ঞ উইল্‌কিন্‌স (C. Wilkins) কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নির্মিত হরফেই হ্যালডের "A Grammar of the Bengal Language" গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল 'হুগলিতে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের ইতিহাস এই থেকেই শুরু'।[৫]

কলকাতায় অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের দিকে সতেরটি ছাপাখানা এবং মুদ্রাকরের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন। তাঁদের সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়ান। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁরা কমপক্ষে ৩৬৮ টি গ্রন্থ ছেপেছিলেন।[৬] গ্রন্থ ছাড়াও এসময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাও ছাপা হয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপরে স্থাপিত ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে উইলিয়াম কেরীর (W. Carey) তত্ত্বাবধানে বাংলা, ভারতীয় এবং অন্যান্য ভাষায় বাইবেল, খৃস্টধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল। এছাড়াও ব্যাপ্টিক মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সামায়িকপত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার লালদিঘি পাড়ায় ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ছাপাখানা গড়ে ওঠে আঠারো

খ্রিস্টাব্দে, অন্যদিকে উনিশ খ্রিস্টাব্দে বাঙালিদের ছাপাখানার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুতানুটি। শোভাবাজারের বালাখানায় অবস্থিত ছিল "বান্ধা বটতলা"। বর্তমানে এই বটতলা পুলিশ স্টেশন হিসেবে পরিচিত। এই বটতলায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বনাথ দেব। 'তাঁর ছাপাখানা থেকে প্রথম বই (Imprint) বের হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে'।[৭]

৩. বটতলার ছাপাই ছবির স্বরূপ

উইলকিন্‌স-এর নির্মিত অক্ষর ছাপার ৩৮ বছর পর কলকাতায় সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় "অন্নদামঙ্গল" সচিত্র গ্রন্থ মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে অপ্রাতিষ্ঠানিক বাঙালি খোদাই শিল্পীদের ধাতু ও কাঠখোদাই ব্লকে ছাপা চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমেই বস্তুত কলকাতা তথা ঔপনিবেশিক বাংলার বটতলায় ছাপচিত্রের প্রারম্ভিক সূচনা। এ প্রসঙ্গে কমল সরকার লিখেছেন এভাবে: '১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ৩১৮ পৃষ্ঠার ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের যে 'অন্নদামঙ্গলে'র সংস্করণটি গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেন সেটিই বাংলা ভাষার এ পর্যন্ত জ্ঞাত প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাংলার শিল্পীদের চিত্রাঙ্কিত প্রথম গ্রন্থ রূপেও অভিহিত হতে পারে গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত এই 'অন্নদামঙ্গল'। গ্রন্থটি ছ'টি এনগ্রেভিং চিত্রে (ধাতু ও কাঠখোদাই) শোভিত হলেও মাত্র দুটি চিত্রই স্বাক্ষরিত। এ দুটি ধাতু খোদাই চিত্রের নীচে খোদিত আছে: Engraved by Ramchaund Roy. সম্ভবতঃ রামচাঁদের সঙ্গে অন্য কোনো শিল্পী খোদাই চিত্রগুলি রচনা করেন। কিংবা বাকি চারটি চিত্র কাঠখোদাই হওয়ায় শিল্পী রামচাঁদের স্বাক্ষর বর্জিত। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে'।[৮]

অন্নপূর্ণা, ধাতু খোদাই (অন্নদামঙ্গল, ১৮১৬), শিল্পীর নাম নেই

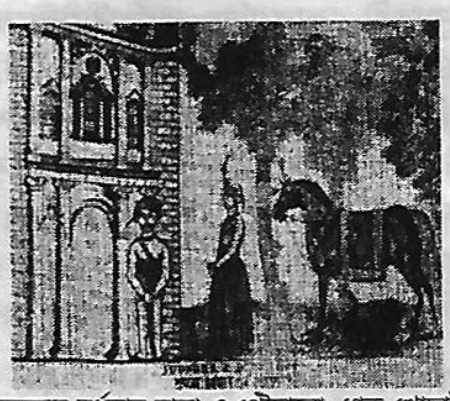

সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা ও পৌছানো, ধাতু খোদাই (অন্নদামঙ্গল, ১৮১৬), রামচাঁদ রায়

"অন্নদামঙ্গল" গ্রন্থে প্রথম ধাতুখোদাই ব্লকে ছাপাকৃত চিত্রটি হলো: "অন্নপর্ণা" নামক দেবী বা মূর্তির। মূর্তিটি একটি কারুকার্যময় জলচৌকির উপর একটি পদ্মের মাঝখানে যোগাসনে উপবিষ্ট। তার এক হাতে যে অন্নপাত্রটি দেখা যাচ্ছে, তাতে অনেকটা বিদেশি গড়নের প্রভাব পরিলক্ষিত। মূর্তির অবয়বে বাস্তবতা অস্পষ্ট হলেও খোদাইকর্মে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় মেলে। বস্তুত "অন্নদামঙ্গল" সচিত্র গ্রন্থটিকে কেন্দ্র

করেই উনিশ খ্রিস্টাব্দের দু'দশকে বাংলা গ্রন্থকে নানাভাবে সচিত্রকরণের সুত্রপাত ঘটে বটতলায়। বটতলার ছাপাখানাতে এসব গ্রন্থ ও পঞ্জিকা সচিত্রকরণে সাধারণত দেশিয় শিল্পী বা কারিগরদের ধাতু ও কাঠখোদাইকৃত চিত্র মুদ্রিত হতো। ধারণা করা হয়, কারিগর বা শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ধাতু ও কাঠখোদাই-এর করণকৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাঠখোদাই শিল্পীরা যে পূর্ব থেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন তার সত্যতা আমরা পাই বটতলা প্রিন্টের অন্যতম গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষ-এর প্রাসঙ্গিক তথ্যে: 'এতদিন পুঁথির পাট্টায় অথবা পৃষ্ঠায় ছবি এঁকে এসেছেন, তাদের ডাক পড়ল ছাপা বই চিত্রিত করার জন্যে। কাঠখোদাই তাঁদের ভালোই জানা ছিল, সুদীর্ঘ পুঁথি পাণ্ডুলিপির যুগে এই কাঠখোদাইয়ে তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ছাপাখানার প্রথম যুগে কাঠখোদাই ছাড়া ছবি-ছাপার উপায়ও ছিল না, তাদের সঙ্গে ধাতুখোদাইও চলতো। সুতরাং বটতলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে বাঙালী কারিগর-শিল্পীদেরও চাহিদা বাড়লো'।[৯] গ্রন্থচিত্রণের প্রয়োজনে অনেক শিল্পী চিত্র আঁকলেও সম্ভবত তাদের অনেকেই খোদাই শিল্পী-কারিগর ছিলেন না। খোদাই শিল্পীরাই যে, সে সময়ে কাঠখোদাইকার্য করতো, এ ব্যাপারে আরো স্পষ্টতা প্রকাশ পায় "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে: 'The plates cost in general a gold mohur, designing, engraving and all, for in the infancy of this art, as of many others, one man is obliged to act many parts.'[১০]

এ সময়ে কাঠখোদাইয়ে ছাপ নেওয়ার ক্ষেত্রে নকশা করা হতো তেতুল কাঠের উপরিতলে। উনবিংশ খ্রিস্টাব্দের দিকে কলকাতার বাংলা গ্রন্থে ছাপাই চিত্রের খোদাই শিল্পীদের মধ্যে নাম পাওয়া যায়: 'রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, গোপীচরণ স্বর্ণকার, বিশ্বম্ভর কর্মকার, পঞ্চানন দাস, নফরচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, নেত্যলাল দত্ত, মাধবচন্দ্র দাস, পঞ্চানন কর্মকার, হীরালাল কর্মকার, কার্ত্তিকচন্দ্র কর্মকার'।[১১] এছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রি, কাশীনাথ মিস্ত্রিও ও হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এই খ্রিস্টাব্দের অন্যতম কৃতী খোদাই শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। রামচাঁদ রায়ের পর উনিশ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় দশকের অন্যতম বাঙালি কৃতি খোদাই শিল্পী হলেন কাশিনাথ মিস্ত্রী। 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির (১৮১৭) উদ্যোগে প্রকাশিত "Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy" গ্রন্থে কাশিনাথের ধাতুখোদাই চিত্রযুক্ত হয়'।[১২] ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে "ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া" ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ছাপাইকর্মে বাঙালি খোদাই শিল্পী হরিহর-এর কৃতিত্বের প্রসংশা করে লেখা হয়েছে, 'Both the design and the execution of the plates have been cexclusively the efforts of native genius;..Mr. Huree Hur Banerjee who Living in Jorasanko.'।[১৩]

জন লসন (Jhon Lowson) কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র মাসিক "পশ্বাবলী" (১৮২২)-এর চিত্রগুলো তাঁরই অংকিত এবং খোদাইকৃত বলে অনুমেয়। যতদূর জানা যায়, অনেক বাঙালি শিল্পীকে তিনি খোদাইকর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। মূলত এসব খোদাই শিল্পীদের একনিষ্ঠ কর্ম প্রচেষ্টার ফলেই কলকাতায় কাঠখোদাই শিল্পের সদর্প-পদচারণা। এ পর্যন্ত প্রথম ছাপা যে পঞ্জিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এই পঞ্জিকায় একটিমাত্র চিত্র ছিল, যাতে দেখানো হয়েছে এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।[১৪] এসময়ের অন্যতম কাঠখোদাই শিল্পী বিশ্বম্ভর আচার্যকৃত দু'টি কাঠখোদাই ও চারটি ধাতুখোদাই চিত্র ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার-এর "গৌরী বিলাস" নামক দু'টি গ্রন্থে ছাপা হয়। এর মধ্যে "দশভূজা"-এর খোদাই চিত্রটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। "গৌরীবিলাস" অপর গ্রন্থটিতে দশটি কাঠ ও ধাতু খাদাই চিত্র রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বনাথ দেবের ছাপখানা থেকে মুদ্রিত "বত্রিশ সিংহাসন" (১৮২৪) নামক গ্রন্থেও তাঁর ধাতু খোদাইকৃত ছবির নিদর্শন রয়েছে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে "অন্নদামঙ্গল"-এর অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যাতে রূপচাঁদ আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, বীরচন্দ্র দত্ত ও রামসাগর চক্রবর্তী সহ আরো কয়েকজন কৃতী খোদাই শিল্পীর দশটি ধাতুখোদাই চিত্র ছাপা হয়। এসব সচিত্র গ্রন্থের পরিবর্তীকালে "হরিহরমঙ্গল" বেরিয়েছিল সম্ভবত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, অত বড় এবং অত বেশি চিত্র সম্বলিত বাংলা গ্রন্থ উনবিংশ খ্রিস্টাব্দে আর দ্বিতীয়টি বের হয়নি।[১৫]

পঞ্জিকা প্রচলনের পূর্বেই কাঠ ও ধাতু খোদাই শিল্পীরা চিত্র নির্মাণ করতেন গ্রন্থের কাহিনীভিত্তিক অথবা বংশানুক্রমিক প্রচলিত শিল্পধারায়। বিগত খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থচিত্রণের বিষয়বস্তুতে নতুনমাত্রা যোজিত হতে থাকে। লসনের ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত "পশ্বাবলী"-এর অপর একটি রচনায় নানা প্রকারের জীবজন্তুর খোদিত ছাপাই চিত্রে গতানুগতিক বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়। তবে খোদাই শিল্পীরা ছিল অজ্ঞাত। যতদূর জানা যায়, 'উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে অন্যতম কৃতি খোদাই শিল্পী রামধন স্বর্ণকার। রামধনই বাংলা ভাষার সর্বাধিক ধাতুচিত্রে শোভিত গ্রন্থের শিল্পী। তাঁর সর্বাধিক ধাতুচিত্র সম্বলিত গ্রন্থের নাম "হরিমঙ্গল সঙ্গীত"। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের আদেশে দেওয়ান পরাণচন্দ্র রচিত এ গ্রন্থটিতে রামধন স্বর্ণকারের ৭১টি ধাতুখোদাই চিত্র যুক্ত হয়'।[১৬] তিনি প্রতিকৃতি খোদাইকর্মেও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ধাতুপাতে তক্ষণকৃত ছাত্রবন্ধু ডেভিড হেয়ারের প্রতিকৃতি ছাপাই ছবিটি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সংগ্রহ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগ্রহীত হয়। এছাড়াও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন রবিন্‌সন (John Robinson) মেরি ও চার্ল্‌স ল্যাম্ব "টেল্‌স্ ফ্রম শেক্সপিয়ার" নামক গ্রন্থটি বাংলানুবাদ করে প্রকাশ করেন। এতে রামধন স্বর্ণকারের ছয়টি ধাতুখোদাই চিত্র ছাপা হয়েছিল। চিত্রগুলোতে একজন দক্ষ এনগ্রেভারের পরিচয় পাওয়া যায়।

গজকচ্ছপ ও গুরুড়, কাঠখোদাই, নফরচাঁদ বন্দোপাধ্যায়।

রাজকন্যা সন্ধ্যাবতী, কাঠখোদাই, কার্তিক চন্দ্র বসাক।

অন্য দিকে পঞ্জিকা চিত্রণে স্থান দখল করে গ্রাম-বাংলা আর বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় চিত্র-সম্ভার। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন রচনার সূত্রে কাঠখোদাই শিল্পীরা শুধু নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্রের দিকেই চোখ ফেরালেন না, তাঁদের অর্জন করতে হলো হরফ-নির্মাণ, হরফ-বিন্যাস, বিজ্ঞাপনের পক্ষে মানানসই Caligraphy-ঘেঁষা হরফ আবিষ্কারের কৌশল।[১৭] পঞ্চানন কর্মকারের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও জামাতা মনোহর ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার (১৮০৭-১৮৫০) যুথবদ্ধে বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাংলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার গ্রন্থ ও চিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।[১৮] "নতুন পঞ্জিকা"য় পূর্ণপৃষ্ঠায় কৃষ্ণচন্দ্রের চমৎকার ও আকর্ষণীয় সব কাঠখোদাইকৃত চিত্রের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু দেব-দেবী, চরক, রথযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি বিষয়বস্তু সম্বলিত এসব কাঠখোদাই চিত্রের নীচে স্পষ্টভাবে "কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের কৃত" স্বাক্ষরের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর এসব খোদাইকর্মে আধুনিক ছাপাই কৌশলের প্রকট ছাপ লক্ষণীয়। অর্থাৎ কলকাতায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রের অন্যতম শৈল্পিক মাধ্যম "এনগ্রেভিং"-এ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

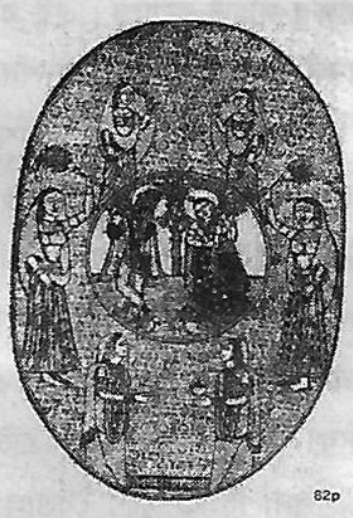

সখি পরিবৃত্ত রাধাকৃষ্ণ, কাঠখোদাই, পঞ্চনন কর্মকার

ঘোড়া ঘেতুর ও হানিফা (ইসলামী গ্রন্থে প্রাপ্ত ছবি), কাঠখোদাই, শিল্পীর নাম নেই।

বটতলার বাংলা গ্রন্থচিত্রণে লিথোগ্রাফির নিদর্শন আমরা পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে "সিন্ধুযন্ত্রে" মুদ্রিত ফিরদৌসীর "সাহনামা"-এর বাংলা সংস্করণ গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে অনুবাদকের প্রতিকৃতি চিত্রটি গ্রন্থের দ্বিগুণ আকৃতিতে লিথো প্রথায় ছাপা হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" গ্রন্থটিতে লিথো প্রথায় ছাপাকৃত তেরটি চিত্র যুক্ত হয়। এই গ্রন্থচিত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ হাওড়া স্টেশনের নিখুঁত দৃশ্য। এছাড়াও এতে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, পাহাড়, পুল আর কলেজের দৃশ্যও নিপুণভাবে ফোটে ওঠেছে। কিন্তু, শিল্পী বা লিথোগ্রাফারের নামের উল্লেখ এখানে নেই। তবে অনুমান করা হয়, এই চিত্রটিতেও কোনো বিদেশি শিল্পীর হাতের ছোঁয়া রয়েছে। এছাড়াও একই গ্রন্থে শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত এবং গোপারচন্দ্র চক্রবর্তী'র অঙ্কিত "কলিকাতাবধি রানীগঞ্জ পর্যন্ত ভারতবর্সীয় রেলওয়ের মানচিত্র" নামক রঙিন লিথো চিত্রটি অনন্য নিদর্শন। কলকতার ১০ নং মেঙ্গো লেনে স্থাপিত বেনটিঙ্ক ছাপাখানায় ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত হয়েছিল নাটকের গ্রন্থ। সুকুমার সেন লিখেছেন: 'তাতে চারটি ছবি ছিল দু রঙা লিথোয়। এর আগে বাংলা কোন সাহিত্য বা অন্য গ্রন্থে দু তিন রঙা ছবি দেখিনি'।[১৯] যদিও লিথোগ্রাফি প্রথায় চিত্র নির্মাণ এ সময়ে খুবই সহজলভ্য ছিল না। তদুপরি, বাংলা গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ছাপচিত্রকলার যে উন্মেষ ঘটেছিল তা অনস্বীকার্য।

বটতলায় ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে পঁচাত্তরটি ছাপাই চিত্রের নিদর্শন রয়েছে। এতে পঞ্চানন কর্মকারের কাঠখোদাইকৃত দু'টি কৃষ্ণলীলা চিত্রের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। ডিম্বাকৃতির একটি কাঠখোদাই চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ছয় সখী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণ, নীচের অংশে "শ্রীপঞ্চানন কর্মকারের" স্বাক্ষর খচিত রয়েছে। এই বটতলায় মুসলমান প্রকাশকদের "লজ্জতন্নেছা" নামক গ্রন্থে একটি খোদাই চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাতে কালিঘাট চিত্রশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। মেছুয়াবাজার থেকে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থ সচিত্রকরণে আর্কষণীয় সব কাঠখোদাই ছাপাই চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। "বড় সত্যপীর" ও "সন্ধ্যাবতী কন্যা" গ্রন্থ পাঁচ বা ছয়টি ছাপাই চিত্র রয়েছে। একটি চিত্রে শিল্পীর নাম খোদিত রয়েছে, "কার্ত্তিক কর্মকারের কৃত সাং দরজিপাড়া"। আর দু' একটি চিত্রে স্বাক্ষর না থাকলেও শিল্পীর হাতের আঁচড়ের টান অনুভূত হয়।[২০] এছাড়াও অপর ইসলামী গ্রন্থে ব্যবহৃত "ঘোড়া ঘেতুর ও হানিফা" কাঠখোদাই ছাপচিত্রটি একটি অনন্য নিদর্শন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে অজ্ঞাত শিল্পীর "গলদা চিংড়ি মুখে বেড়াল" রঙিন চিত্রটি বটতলার একটি উল্লেখযোগ্য কাঠখোদাইকৃত ছাপচিত্রের নিদর্শন।

গলদা চিংড়ি মুখে বিড়াল, কাঠখোদাই (রঙিন), শিল্পীর নাম নেই।

প্রোমেদা সুন্দরী, লিথোগ্রাফ (রঙিন), কাসাঁড়িপাড়া আর্ট স্টুডিও

বটতলায় ধাতুখোদাই, লিথোগ্রাফ মাধ্যমে চিত্র ছাপাই হলেও মূলত কাঠখোদাই ছিল প্রধানতম মাধ্যম। কাঠখোদাই ছাপচিত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন প্রিয়গোপাল দাস ও হরিদাস সেন। কাঠখোদাই মাধ্যমে প্রতিকৃতি রচনায় তারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উনিশ খ্রিস্টাব্দের শেষ দশক থেকে প্রকাশিত নানা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সৃষ্ট কাঠখোদাই কর্ম ছাপা হতো। বিশেষত প্রতিকৃতি রচনায় প্রিয়গোপাল দাসের অকৃত্রিম দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কমল সরকার লিখেছেন: '১৬/১৭ বৎসর বয়স হইতে তিনি উড-এনগ্রেভিং বা কাঠের ব্লক খোদাই করিতে আরম্ভ করেন এবং আজীবন এই কাজ করে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি অর্জন করে যান। ...যখন হাফটোন ও লাইন ব্লকের অস্তিত্ব ছিল না, তখন এদেশে বাঙ্গলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্য ব্লক তৈরি করতে হলে প্রিয়গোপালের সহযোগিতা নিতে হতো'।[২১]

খোদাই শিল্পীরা শুধু গ্রন্থচিত্রণের জন্য চিত্র খোদাই করতেন, তা নয়। এক পর্যায়ে তারা বিভিন্ন আকারের স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রশস্ত কাগজে কাঠখোদাই মাধ্যমে ছাপচিত্র নির্মাণে ঝোঁকে পড়েন। পরবর্তীকালে বটতলায় সৃষ্টিকৃত ব্রডশীট (Broad sheet) উড ব্লক প্রিন্ট (Wood block print) "জনপ্রিয় শিল্প" ব "Popolur Art" হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ বলা যায়, চিত্র সামাজিকরণের এক নবতর ধারা তাঁরা সূচনা করেন। অতি সস্তায় চিত্রগুলো বিভিন্ন সামাজিক উৎসব ও পূজা-পার্বণে সচারচর বিক্রি হতো। মূলত স্বল্প আয়ের শ্রেণীভূক্ত মানুষজনই ছিলেন এর সমঝদার। সাধারণত উঁচু সমাজের মানুষের কাছে এসব চিত্রের তেমন কদর ছিল না। বিষয়-বৈচিত্র্যে বটতলার কাঠখোদাই শিল্পীদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বটতলার কাঠখোদাই চিত্রকে শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক পূর্ণেন্দু পত্রী তিনভাবে বিভাজন করেছেন, '১.পৌরাণিক, ২.ঐতিহাসিক, ৩.সামাজিক'।[২২] ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সুপ্রাচীন

দেব-দেবী, মহাভারতের কাহিনী ছাড়াও পর্যায়ক্রমে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী, লৌকিক ব্রত-উৎসব এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বণের চিত্র ছাপাই করা হতো।

বটতলার শিল্পীরা দেব-দেবী, পুরাণের চরিত্রদের মানুষের আদলে রূপবন্ধ করলেও পরিবেশে এসেছে আধুনিকতার ছাপ; নানা বৈচিত্রময় পোষাকে সজ্জিত করছে পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক চরিত্রাবলী। কখনো ধর্মীয় গ্রন্থ সচিত্রকরণেও বিদেশি বা বিজাতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে পোষাক-পরিচ্ছদে আধুনিকতা আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন। প্রহসনমূলক বিষয়ের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের বৈপরিত্য অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিদ্রুপের চিত্র শিল্পীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ছাপাই চিত্রে তুলে ধরেছেন। সমাজ জীবনের চালচিত্রের মধ্যে সাহেবী শ্রেণীর খণ্ডচিত্র, সমসাময়িক প্রবাহমান নানা ঘটনানির্ভর কিস্‌সা কাহিনী, গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সুশীলা সুন্দরী, গড়ের মাঠে বেলুন চড়া ছাড়াও কলকাতার প্রকৃতি ও শহুরে জীবনযাত্রার চিত্রও তাঁদের বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়েনি। যেমন: 'ঔপনিবেশিক স্থাপত্য ডোরিক-আইওনিয়ান-রোমান কলাম, বাড়ির মাথায় সিংহ-ইউনিকর্ণ-পরী, ঝাড়-লণ্ঠন-রকমারি বাতিদান, বাহারি কার্পেট বা কার্টেন-কিছুরই অভাব নেই। ঘরবাড়ি, থিয়েটার স্টেজের মতো ছক, কলাগেছে থাম-গ্যাসের বাতি-সবই পারিপার্শ্বিক থেকে আহৃত'।[২৩]

বটতলার কাঠখোদাই চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত, একাধিক নারী চরিত্র আর প্রকৃতিনির্ভর কাংড়া ও রাজপুত চিত্রের আদলই ভেসে ওঠে। অর্থাৎ বৃটিশ বা ইউরোপীয় চিত্ররীতিতে বিশেষত আলো-ছায়ার কৌশল প্রয়োগে আকৃষ্ট না হয়ে বরং কাংড়া, মোঘল, রাজপুত, কালিঘাট পটচিত্র আর লোকজ ঐতিহ্য ধারা বজায় রেখে টেরাকোটা শৈলী থেকে আলো-ছায়ার গড়নের ডৌলকে তাদের চিত্রে আকড়িয়ে ধরেন। প্রাসঙ্গিকক্রমে শিল্প-সমালোচক পূর্ণেন্দু পত্রী লিখেছেন: 'বটতলা উডপ্রিন্ট কালীঘাটের ছবি থেকে নিয়েছিল গড়নের সারল্য। আর তারই সঙ্গে সে নিজে সংযোজিত করেছিল আবহমানব্যাপী ভারতীয় শিল্পকলার অলঙ্করণ-চাতুর্য এবং ইংরেজ-উপনিবেশ হিসেবে গড়ে-ওঠা শহর-কলকাতার সর্বাধুনিক কালচারের লক্ষণসমূহ। যে কেনো জীয়ন্ত শিল্পের অভিপ্রায় এবং অন্বেষণ তো এটাই যে বহুবিধ শিল্পধারা থেকে রস নিয়েই সে নিজেকে গড়ে তুলবে সতেজ এবং পুনরাবৃত্তিহীন! অতি অল্প পরামায়ূ সত্ত্বেও বটতলার ছাপাই ছবিতে সে দৃষ্টান্ত অমোঘ এবং স্মরণীয়'।[২৪]

এসব কাঠখোদাই ছাপাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণত পাতলা জাতীয় কাগজ, দেখতে অনেকটা ঘুড়ির কাগজের মতো, যা মানসম্পন্ন ছিল না। অবশ্য এর পেছনে যে কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলো সস্তা কাগজে ছাপচিত্র স্বল্প মূল্যে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার বিষয়টি। তাছাড়া চিত্রটি যে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব এ ব্যাপারটিও তাদের নজরে ছিল না। কাঠখোদাই চিত্রের আকার-আকৃতির ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট ধারণা আমরা পেতে পারি, বটতলা কাঠখোদাই চিত্রের সর্বাধিক সংগ্রাহক রাধাপ্রসাদ গুপ্তের এই বিষয়ের প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যে: 'এই কাঠখোদাইগুলি খাড়াভাবে

আর আড়াআড়ি দুভাবেই ছাপা হতো। খাড়া চৌকো কাঠখোদাইগুলির সাইজ সাধারণত ছিল উচ্চতায় ১৪.৫ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৯.৫ ইঞ্চি। এবং আড়াআড়ি কাঠখোদাইগুলি চওড়ায় ১৩.৫ ইঞ্চি ও উচ্চতায় ১০.৫ ইঞ্চি অথবা ১৩ ইঞ্চি আর ৯.৫ ইঞ্চি। বালির কাগজের মতন চেহারায় খুব পাতলা কাগজে কাঠ-খোদাইগুলি ছাপা হত। কিন্তু, ছবির চারপাশে লাইন দিয়ে ফ্রেম করা থাকত যাতে ছবিগুলো আরো খোলে'।[২৫]

কাঠখোদাই চিত্রগুলো মুলত কালো কালিতে ছাপা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রে কালো কালির উপর দিয়েই লাল, হলুদ, সবুজ এই তিন রঙ ব্যবহার করে রঙের ছোপ লাগানো হতো। এই ছোপ লাগানোতে শিল্পীরা কখনো স্টেনসল্ ব্যবহার করতেন না, তাদের খোদাইকর্মে ব্যক্তিগত হাতের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো একটি পুরো কাগজে একাধিক চিত্রও ছাপা হয়েছে। 'প্রায় একই আকারের কাগজে একসঙ্গে আটখানা ছবি ছাপা হয়েছে এমনও দেখা যায়'।[২৬] তবে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থচিত্রণের জন্য কাঠখোদাই ছাপচিত্রের আলোচনা-সমালোচনা যেভাবে হয়েছে, বড় মাপের স্বতন্ত্র কাগজে কাঠখোদাইকৃত ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। এসময় খোদাই শিল্পীরা যথাসম্ভব বড় মাপের কাঠখোদাই চিত্র খুব একটা করেননি কিংবা উল্লেখ সংখ্যক বড় আকারের ছাপাই চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'বড় আকারের (সাধারণত ২৭৫x৩৫০ মিমি বা ২৩৮x৩৭৮ মিমি) কাঠখোদাই যে খুব বেশি আছে তা নয়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম এবং কলকাতার দুই-তিনটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ মিলিয়েও জ্ঞাত কাঠখোদাই একশও হবে না'।[২৭]

'লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যেসব নমুনা রয়েছে, তার একাংশ দান করেন খ্রিশ্চিয়ান লিটারেচার সোসাইটি (Christian Literature Society)। দানের তারিখ ১৯ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ছবি তারিখবিহীন'।[২৮] এছাড়াও কলকতায় যে সব ব্যক্তিগত সংগ্রহে কাঠখোদাইচিত্র রয়েছে সেগুলোতেও তারিখ উল্লেখ নেই। যতটুকু জানা যায়, এ পর্যন্ত তারিখ যুক্ত একটি কাঠখোদাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা লেলিনগ্রাডে সংগৃহীত রয়েছে। 'তারিখ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ'।[২৯] অধিকাংশ কাঠখোদাই ছাপাকর্মে খোদাইশিল্পী স্বাক্ষরের নির্দশন পাওয়া না গেলেও ছাপাইকর্মে দক্ষতার পরিচয় পাওয় যায়। তবে খোদাইকর্মে উৎকর্ষতার নমুনা দেখে ধারণা করা যায়, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারি আর্ট স্কুলে একাডেমিক রীতিতে প্রশিক্ষিত কোনো কোনো শিল্পীও এই খোদাই কর্মে তাঁদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এদৎ সত্ত্বেও বটতলার কাঠখোদাই চিত্র দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। কলকাতায় একদিকে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠার ফলে একাডেমিক রীতিতে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্টুডিও'র একাডেমিক ধাঁচের লিথোগ্রাফ ছাপাই ছবি এবং কাঁসাড়িপাড়া আর্ট স্টুডিও থেকেই লিথোপ্রথায় ছাপাইকৃত ছবি এবং অন্যদিকে কালিঘাটের পটচিত্র ও ছাপাই ছবির জয়যাত্রার যাতাকলে বটতলার কাঠখোদাই ছাপাই ছবির বিপর্যয় ঘটে।

উপসংহার

বটতলায় গ্রন্থচিত্রণ এবং স্বতন্ত্র কাগজে বিভিন্ন আকারে কাঠখোদাই, ধাতুখোদাই ও লিথোগ্রাফি ছাপাইয়ে যে সব শিল্পীদের অবদান রয়েছে, তারা ছিলেন মূলত বংশ পরম্পরা ও বিদেশি কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত- কোনো একাডেমিক নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষিত খোদাই শিল্পী তারা ছিলেন না। তারা অনেকেই কোনো না কোনোভাবে ছাপাখানার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মূলত কাঠখোদাই ছিল প্রধানতম ছাপাই মাধ্যম। ছাপচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বটতলার অশিক্ষিত খোদাই শিল্পীরা অনেকটা একই ধরনের ব্লক ব্যবহার করে চিত্র ছাপাতেন। এই রীতির শিল্পীরা কোনো পৃষ্ঠপোষক বা বিত্তবানদের চাহিদা মাফিক চিত্র ছাপাতেন না, তারা ছিলেন অনেকটা স্বাধীনচেতা শিল্পী। এসময় কলকাতা শহরে ব্যাপকহারে বিক্রী হতো শ্রীরামপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত ছাপাই চিত্র, যিনি একাধারে ছিলেন খোদাই শিল্পী ও ছাপাখানার কর্ণধার।

বিষয়বৈচিত্র্যে পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অসঙ্গতি নির্ভর ছবিগুলোতে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত। এ প্রসঙ্গে রাধাপ্রসাদ গুপ্তের একটি রচনার উল্লেখ রয়েছে এভাবে: 'লণ্ডনে হোয়াইট চ্যাপেল গ্যালারি ও ভিকটোরিয়া এ্যাণ্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়মের যৌথ চেষ্টায় 'আর্টস অফ বেঙ্গল' বলে একটি বিরাট প্রদর্শনী ৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষে লণ্ডনে ও ৮০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় মানচেস্টারে দেখানো হয়। এই প্রর্দশনীতে অবিভক্ত বাংলাদেশের নানান শিল্প-সামগ্রীর সঙ্গে কলকাতার কাঠখোদাইও স্থান পায়। এখন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা, শিল্প-সমালোচক, শিল্প রসিকেরা এগুলির শিল্পোৎকর্ষ ছাড়া এগুলিকে গত শতাব্দীর শেষদিকের কলকাতার জীবনের জীবন্ত ছবি ও মূল্যবান দলিল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[৩০]

উনিশ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষিত সমাজের পরিমণ্ডলে তাদের শিল্পসৃষ্টি মর্যাদা লাভ করতে না পারলেও এই অশিক্ষিত বাঙালি শিল্পীদের শিল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রলুব্ধ হয়ে ইউরোপের আধুনিক ধারার অনেক শিল্পী তাঁদের শিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন: হেনরি ওঁরিও মাঁতিস, পাবলো পিঁকাসো, ফারনাণ্ড, জর্জেজ ব্রাক প্রমুখ ইউরোপীয় কালজয়ী শিল্পদের চিত্রকর্মে বটতলার ছাপাই চিত্রের শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। দেশি-বিদেশি সংগ্রাহকের কারণে বটতলার কাঠখোদাই ছাপাই ছবি এখনও সমুজ্জ্বলে বিদ্যমান। বটতলার ছাপাই ছবির মধ্য দিয়েই কলকাতার আদি চিত্রকলা আধুনিক চিত্রকলার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়- একথা স্বীকার করা সমীচীন বলে মনে করি।

তথ্য নির্দেশ

১ 'Grants of land were recoded by engraving on copperplate and engraved images for religious and secular use on metal ware was in traditional practice. The expertises of etching on different surfaces like bone, wood, shell, ivory and conch was popular

crafts. The art of stamping with a master block was used since ancient times.' (প্রবন্ধকার কর্তৃক অনুবাদকৃত),
Bhavna Kakar, "Print making: Story and History"
{http://www.artconcerns.net/2007jan1/html/essay_Printmaking1.htm}(প্রেক্ষিত তারিখ: ২১/০৩/২০১০)।

[২] শ্রী পান্থ, *বটতলা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ৭৩।

[৩] ভারত কোষ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৮৬), পৃ. ৫৬২।

[৪] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ৭৪। [ভারতে ছাপাখানা ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য: Prialkar, A.K., *The Printing Press India*, Bombay, 1958 এবং শ্রী পান্থ, *যখন ছাপাখানা এলো*, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. ৪।]

[৫] সুকুমার সেন, বটতলার ছাপা ও ছবি, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, সংস্করণ ২০০৮), পৃ. ২৫।

[৬] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ৭৪ [Shaw,Graham, *Printing in Calcutta to 1800*, London,1981.]

[৭] তদেব, পৃ. ৭৪।

[৮] কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্তরঞ্জণ সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ৩১৩।

[৯] পূর্ণেন্দু পত্রী, "বটতলা উড প্রিন্টের ছবি", *শিল্প সংক্রান্ত* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ১৩১।

[১০] তদেব, পৃ. ১৩২।

[১১] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, পৃ. ৪১।

[১২] কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্তরঞ্জণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ. ৩১৪।

[১৩] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ৭৬। [বাগল, যোগেশচন্দ্র; "সে যুগের ধাতুখোদাই ও কাঠখোদাই শিল্প", *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৬১,পৃ. ৭৪ তাছাড়া দ্রষ্টব্য: Bagal, Jogesh Chandra; *History of the Govt. College of Arts and crafts*, Centenary; Government College of Art and Craft, Calcutta, 1964]

[১৪] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ২৩।

[১৫] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, পৃ. ৩২।

[১৬] কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্তরঞ্জণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ. ৩১৬ [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংকলিত,'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড দ্র. সম্পাদকীয়]

[১৭] পূর্ণেন্দু পত্রী, "বটতলা উড প্রিন্টের ছবি", *শিল্প সংক্রান্ত*, পৃ. ১২২-২৩।

[১৮] প্রবীর সরকার, "কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার)", চিত্তরঞ্জণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ. ৮৫।

[১৯] সুকুমার সেন, "বটতলার বই", চিত্তরঞ্জণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ. ২৭১।

[২০] তদেব, পৃ. ৪০।

[২১] কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি (১৮১৬-১৯১৬)", চিত্তরঞ্জণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ. ৩২৭ [আনন্দবাজার পত্রিকা। দ্র. 'শোক সংবাদ', ২৫ মাঘ ১৩৩৪।]

[২২] পূর্ণেন্দু পত্রী, "বটতলা উড প্রিন্টের ছবি", *শিল্প সংক্রান্ত*, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৭।

[২৩] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ৮৬।

[২৪] তদেব, পৃ. ১৪১।

[২৫] পূর্ণেন্দু পত্রী, "বটতলা উড প্রিন্টের ছবি", *শিল্প সংক্রান্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭।

[২৬] শ্রী পান্থ, *বটতলা*, পৃ. ৮৪ [এক কাগজে আটটি ছবির নমুনা রয়েছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কাঠখোদাই সংগ্রহে। দ্র. মিলডেড আর্চারের তালিকায় ১১ নং (Add or 914). Archer, Mildred; 'Calcutta Woodcuts'; *Indian Popular Painting* (London, 1977) p. 167.]

[২৭] তদেব, পৃ. ৮৪।

[২৮] তদেব, পৃ. ৮২-৮৩।

[২৯] তদেব, পৃ. ৮৩ [Kinizkova, Hana; Thhe Drawing of the Kalighat Style (prague, 1975), p. 56]

[৩০] পূর্ণেন্দু পত্রী, "বটতলা উড প্রিন্টের ছবি", *শিল্প সংক্রান্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭।